Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 *(Index Copernicus International)*
Volume-IX, Issue-IV, July 2021, Page No.73-79
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

রবীন্দ্রনাথের পরলোকভাবনা ও ‘ক্ষুধিত পাষাণ’

অন্তরা দাস
সহকারী অধ্যাপক, কাশী হিন্দু বিশ্বাবিদ্যালয়

Abstract:

We are curious about the world of our afterlife or the life after death. If we had a discussion about the topic about world famous Rabindranath, then our eagerness increased. Rabindranath wrote some short stories which are based on supernatural themes. These stories awaken us about Rabindranath's thoughts regarding the afterlife. When we started to cultivate Rabindranath's thoughts, then we got a lot of information. He wrote the stories as a listener or audience, never directly telling these stories to the reader. He had a conflict about the category of the stories. He thinks that the type of the story's plot came from elysium, not ghostly or spiritual. In his personal life he practiced planchet with Uma Devi. He shared an experience with Sita Devi that some time in the night he was moved like a grope and when the intoxicated condition breaks, he feels that he was another person, not himself. This experience clearly mentioned the split personality of Rabindranath. He has the real experience about the situation. So, he easily sketched the main character of the story ‘Kshudhita Pashan’. The protagonist of the story also had a split personality. For this reason his morning life and nightlife had a big difference. We shall discuss the thoughts of Rabindranath Tagore on afterlife according to ‘Kshudhita Pashan’.

Key words: Rabindranath Tagore, Life after death, Thoughts of the afterlife, Practice of afterlife, Planchet, Short story, Kshudhita Pashan.

মৃত্যুর পরপারের জীবন বা পরলোক সম্পর্কে আমাদের প্রত্যেকের মনেই কম-বেশি আগ্রহ আছে। আর এই পরলোকের আলোচনা যদি রবীন্দ্রনাথ-সংক্রান্ত হয়, তাহলে তো আমাদের আগ্রহ আরও একধাপ বেড়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই ধরনের গল্পগুলিতে সাধারণত স্বয়ং বক্তার ভূমিকা পালন করেননি। অন্যের বলা গল্পকেই পাঠকের সামনে উপস্থিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই গল্পগুলিকে ভৌতিক গল্প বলতে নারাজ ছিলেন। তবে তিনি এই গল্পগুলির জন্য এমন আবহ বা পরিবেশ তৈরি করেছেন, যা আমাদের মনে অনায়াসে ভৌতিক পরিসর গড়ে তোলে। পাঠক এই গল্প পড়ে এক অদ্ভুত গোলক ধাঁধায় ঘুরপাক খায়। সত্য-মিথ্যা সমস্ত কিছুই যেন তালগোল পাকিয়ে যায়। বিষয়টা অনেকটা এরকম—

পুজোর ছুটিতে দেশভ্রমণ সেরে একজন ‘আমি’ এবং তার আত্মীয় বাড়ি ফিরছিলেন, সেই সময় রেলগাড়িতে তাদের এক ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় হয়। ‘আমি’র আত্মীয়টি ‘থিয়সফিস্ট’, নবপরিচিত আলাপী ব্যক্তির কথাবার্তা এবং ব্যবহার থেকে তার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল ‘আমাদের এই সহযাত্রীর সঙ্গে কোনো এক

রকমের অলৌকিক ব্যাপারের কিছু-একটা যোগ আছে; কোনো একটা অপূর্ব ম্যাগ্‌নেটিজ্‌ম্‌ অথবা দৈবশক্তি, অথবা সূক্ষ শরীর, অথবা ঐ ভাবের একটা-কিছু।'[১] 'আমি' অবশ্য এ সমস্ত অলৌকিক ব্যাপারে বিশ্বাসী নন। তাই এই বিষয়ে তিনি গুরুত্ব দেননি। কিন্তু পথে এক বিশেষ ব্যাঘাতের ফলে সেই আলাপী লোকটি এমন এক গল্প ফেঁদে বসলেন যে 'আমি'র ভাষায় শেষ পর্যন্ত 'সে রাত্রে আমার আর ঘুম'[২] হল না।

আপনারা নিশ্চয়ই বুঝে গেছেন, এটা 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পের সূচনাংশ। আপনারা ভাবছেন এমন লেখার অর্থ কী? অর্থ হল এই ধরনের গল্পের পরিমণ্ডল ও আবহের পরিচয় দেওয়া। ভৌতিক ব্যাপার বা ঘটনা— এ সমস্ত বিষয়কে আমরা বিশ্বাস করি বা না করি, এর আকর্ষণ অবশ্যই আছে। রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পের ভিত্তিতেই আমারা জানবার চেষ্টা করব, রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়ে কতটুকু বিশ্বাসী ছিলেন বা ছিলেন না।

আমরা জানি, 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পের দু'জন কথক এবং দু'জন শ্রোতা। দু'জন শ্রোতার মধ্যে একজন পরলোকে বিশ্বাসী থিয়সফিস্ট, আরেকজন পরলোকে অবিশ্বাসী, যে কারণে গল্পের শেষে তাদের জন্মের মতো বিচ্ছেদ ঘটে গেছে। অর্থাৎ গল্পের শুরুতে যে দ্বন্দ্ব তা শেষ পর্যন্ত বিচ্ছেদের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়েছে। তাই প্রশ্ন হল, এই দ্বন্দ্ব কি শুধুমাত্র গল্পের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, নাকি রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও এই দ্বন্দ্ব ছিল? এ প্রসঙ্গে কিছু বলবার আগে থিয়সফিস্টদের সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলব।

থিয়সফি বিষয়টি পাশ্চাত্যের ভাবনা। উনিশ শতকের শেষের দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্টে একটি নতুন ধর্ম হিসাবে থিয়সফি প্রচারিত হতে থাকে। থিয়সফি মূলত রাশিয়ান অভিবাসী হেলিনা ব্লাভাটস্কি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাঁর ভাবনা ও দর্শনকে কেন্দ্র করে থিওসফির রূপরেখা গড়ে ওঠে। হেলিনা ব্লাভাটস্কি ও কর্নেল হেনরি স্টিল ওলকট ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে থিওসফিক্যাল সোসাইটিটি স্থাপন করেন । ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁরা আর্য সমাজের আমন্ত্রণে ভারতে আসেন ও মাদ্রাজের উপকণ্ঠে আডিয়ারে থিওসফিক্যাল সোসাইটির ভারতীয় শাখাটি (১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দ) স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে এটিই সোসাইটির প্রধান কার্যালয়ে পরিণত হয়।

স্বর্ণকুমারীদেবী (রবীন্দ্রনাথের ন'দিদি) ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দ - ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত লেডিস থিয়সফিক্যাল সোসাইটির সভানেত্রী ছিলেন।[৩] এই সোসাইটির অনেক মহান আদর্শ বা উদ্দেশ্য থাকলেও, তা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে 'লোকাতীতের প্রতি সর্বসাধারণের চিরন্তন কৌতূহল এবং আলোকসামান্য ক্রিয়াকলাপের প্রতি মানুষের অন্তর্নিহিত'[৪] দুর্বলতার জন্য। পরে অনেকে এই বিষয়ে এবং থিয়সফির প্রতি আস্থা হারালেন। 'যাই হোক, স্বর্ণকুমারী-জানকীনাথ এবং ঠাকুরপরিবারের অনেকে থিয়সফি ভক্ত ছিলেন।'[৫] এই তথ্য সহজেই বুঝিয়ে দেয় পরলোকচর্চা বিষয়ে ঠাকুরবাড়ির আগ্রহ ছিল। এই আগ্রহের প্রকাশ রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' এবং 'ছেলেবেলা'তেও আছে। জীবনস্মৃতি'তে প্ল্যানচেটের কথা আমরা জানি। তবে ঠাকুরবাড়ির পারলৌকিক বিশ্বাস বা ভূত-বিশ্বাসের ছবিটা 'ছেলেবেলা'তে অনেক বেশি স্পষ্ট— 'রাত্রি ন'টা বাজলে ঘুমের ঘোরে ঢুলু ঢুলু চোখে ছুটি পেতুম। বাহিরমহল থেকে বাড়ির ভিতর যাবার সরু পথ ছিল... চলতুম আর মন বলত কী জানি কিসে বুঝি পিছু ধরেছে। পিঠ উঠত শিউরে। তখন ভূত প্রেত ছিল গল্পে-গুজবে, ছিল মানুষের মনের আনাচে-কানাচে।... সে সময়টাতে হাওয়ায় হাওয়ায় আতঙ্ক এমনি জাল ফেলেছিল যে, টেবিলের নীচে পা রাখলে পা সুড়সুড় করে উঠত।'[৬]

তার মানে ছেলেবেলায় রবীন্দ্রনাথের ভূত-বিশ্বাস ছিল। এবং ছেলেবেলায়, যে প্ল্যানচেট তিনি দেখেছিলেন, অমিতাভ চৌধুরীর মতে ১৮৮০-১৮৮১ সালে তিনি নিজেই তা করেছিলেন। তবে সে সময়ের

তথ্যপ্রমাণ এবং আত্মাদের আগমন দুইই ছিল খুব কম। কিন্তু ১৯২৯ সালে ‘উমাদেবীর মাধ্যমে’ রবীন্দ্রনাথের বহু ‘বৈদেহী আত্মাদের সঙ্গে কথোপকথন’[৭] হয়, যার লিপিকার ছিলেন অমিয় চক্রবর্তী এবং মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়। রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত এ সমস্ত তথ্যের বিবরণ অমিতাভ চৌধুরী তুলে ধরেছেন ‘রবীন্দ্রনাথের পরলোকচর্চা’ গ্রন্থের মধ্যে। এই গ্রন্থে তিনি তথ্যের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের পারলৌকিক বিশ্বাস কতখানি ছিল, তা প্রতিষ্ঠার জন্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে রবীন্দ্র-মতকে প্রকাশ করেছেন ও একত্রিত করেছেন। আগ্রহী পাঠক বইটি পড়ে দেখতে পারেন।

অমিতাভ চৌধুরীর আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারি, রবীন্দ্রনাথ থিয়সফিক্যাল সোসাইটির জার্নালগুলো নিয়মিত পড়তেন, যার মাধ্যমে ‘পারলৌকিক কথোপকথনের বহু কাহিনী জানা যায়।’[৮] এ ছাড়া স্টপফোর্ড ব্রুক, মারগারি রেক্স, দিলীপকুমার রায় ও হিতেন্দ্রনাথ নন্দীর সঙ্গে কথোপকথনের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের জন্মান্তর ও পরলোক সম্পর্কিত ধারণা প্রকাশিত হয়েছে, যার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের এই ভাবনাই প্রকাশিত— যে মৃত্যুর পরেই সব শেষ হয়ে যায় না। অমিতাভ চৌধুরী রবীন্দ্রনাথের পরলোকচর্চায় বিশ্বাসকে যেভাবে প্রমাণ করতে চান, মৈত্রেয়ীদেবী তা মানেননি। তাই তিনি বলেছেন, ‘সম্প্রতি একটা আলোচনা শোনা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের পরলোকচর্চা বিষয়ে। মনে হয় যেন পরলোকে প্রেতযোনি হয়ে তাঁর আত্মীয়স্বজন, তাঁর আত্মীয়স্বজন রূপেই ঘুরে বেড়াচ্ছেন রবীন্দ্রনাথের এই রকম অকাট্য বিশ্বাস ছিল এবং তিনি রীতিমত এই প্রেতলোক সম্বন্ধে চর্চা করে থাকতেন।... কোন একটি দুটি ঘটনা দিয়ে এই ধরনের ধারণায় উপস্থিত হওয়া আমার মতে অন্ধের হস্তীদর্শনের মতোই।’[৯] তিনি মনে করেন, ‘রবীন্দ্রনাথ মৃত্যু সম্বন্ধে অনেক ভেবেছেন, কিন্তু জীবন থেকে মৃত্যুকে কখনো পৃথক করে দেখেননি।... রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু সম্বন্ধে রচনা অজস্র কিন্তু তার মধ্যেও জীবনের বাণীই স্পন্দিত।... মৃত্যু বিষয়ে যে চিরপ্রশ্ন চির নিরুত্তর থেকে মানুষকে কখনও কৌতূহলী কখনও বিস্ময়াভিভূত কখনও শোকাহত করে তার কিছু উত্তর পেয়েছিলেন। তাই যদি না পেতেন তো তার জীবনের সাধনাই ব্যর্থ হয়ে যেত।’[১০]

উমাদেবী-র মধ্যস্থতায় রবীন্দ্রনাথের পরলোকচর্চা সম্পর্কে মৈত্রেয়ীদেবীর বক্তব্য, ‘বুলার মধ্যে অতিপ্রাকৃতের দিকে একটা ঝোঁক ছিল... উমা এই যে একটা অস্বাভাবিক অতিপ্রাকৃত খেলার ঘোরে মেতে উঠেছিল তার প্রতি অকৃপণ স্নেহ এবং সর্ববিষয়ে অসীম কৌতুহলের জন্যই তিনি তার সঙ্গী হয়েছিলেন, এ ঘটনা তার চেয়ে একটুও বেশি নয়। তা বুলার লেখার সাক্ষ্যপ্রমাণ যাই বলুক।’[১১] অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ পারলৌকিক চর্চায় বিশ্বাসী ছিলেন— এ কথা মৈত্রেয়ীদেবী মানতে নারাজ। এ কথা সত্য হতেও পারে। কারণ উমাদেবীর মৃত্যুর পরে রবীন্দ্রনাথ আর প্ল্যানচেট করেননি। সত্যই যদি তিনি এ বিষয়ে বিশ্বাসী এবং উৎসাহী হতেন, তাহলে এই চর্চা চালিয়ে যেতেন।

উমাদেবী মিডিয়াম হয়ে আত্মাদের কথাকে যেভাবে প্রকাশ করতেন, রবীন্দ্রনাথকে তা বিস্মিত করেছিল। তিনি নির্মলকুমারী মহলানবিশকে বলেছিলেন, ‘তার কথাগুলোর ভাষা এবং ভঙ্গীর বিশেষত্ব আছে। উত্তরগুলো শুনলে মনে হয় যেন সেই কথা কইছে।’[১২] রবীন্দ্রনাথের বিস্মিত হওয়া স্বাভাবিক। কারণ উমাদেবী তো সে সমস্ত মানুষকে চিনতেনই না, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের ভাষাতে কথা বলতেন কীভাবে? এই বিষয়টিকে গিরীন্দ্রশেখর বসুর ‘স্বপ্নে অতিপ্রাকৃত বিষয়’ অধ্যায়ের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এই অধ্যায়ের একাংশে গিরীন্দ্রশেখর বসু জানিয়েছেন, “এক হিস্টিরিয়াগ্রস্ত স্ত্রীলোক ফিটের সময় বিশুদ্ধ হিব্রু অনর্গল উচ্চারণ করিত, অথচ সুস্থ অবস্থায় তাহার হিব্রুভাষাজ্ঞানের কোনও লক্ষণ কখনো দেখা যায় নাই। অতএব ঘটনাটিকে ‘ভূতাবেশ’ বলিয়া অনেকে মনে করিলেন কিন্তু অনুসন্ধানে দেখা গেল, শৈশবে

স্ত্রীলোকটি এক পাদ্রীর ঘরে প্রতিপালিত হয়। পাদ্রী প্রত্যহ প্রাতে উচ্চৈঃস্বরে হিব্রুভাষায় বাইবেল পাঠ করিতেন। স্ত্রীলোকটির সেই শৈশবস্মৃতি মন হইতে একেবারে নির্বাসিত হয় নাই। সুস্থ অবস্থায় তাহার স্মৃতির পরিচয় পাওয়া যাইত না, মূর্ছার সময় প্রকাশিত হইত।”[১৩]

উমাদেবীর ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য হতে পারে। যিনি অতিপ্রাকৃত বিষয়ে আগ্রহী এবং ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তার পক্ষে শৈশবে এ সমস্ত মানুষের কথা না শোনার কোনও হেতু ছিল না। এই শৈশবস্মৃতিই হয়তো প্রকাশিত হত মিডিয়ামের কাজ করার সময়। অর্থাৎ তার মধ্যে দুটো ভিন্ন সত্তা ছিল। প্রসঙ্গত বলি, রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও এই দ্বিসত্তা বা আত্মবিযুক্তি ছিল। তিনি সীতাদেবীকে জানিয়েছিলেন, “একদিন রাত্রে ঘুম ভেঙে যেতেই উঠে পড়লুম, ভেবেছিলুম আমার সময় হয়ে আসছে, আসলে কিন্তু তখন দুপুর রাত। অন্ধকার বারান্দার ভিতর দিয়ে, দালান পার হয়ে, আমি grope করতে করতে চলতে লাগলুম।.... কোথায় ঢং ঢং করে দুটো বেজে গেল। আমি থমকে দাঁড়ালুম,... হঠাৎ মনে হল, আমি যেন এ বাড়ি haunt করে বেড়াচ্ছি। আমি যেন মোটেই আমি নয়, ‘আমি’র রূপ ধরে বেড়াচ্ছি মাত্র।”[১৪] এই দ্বিসত্তা আসলে মনেরই অংশ। রবীন্দ্রনাথ তাই ‘অখণ্ডতা’ প্রবন্ধে বলেছিলেন, ‘মানুষের অন্তঃকরণের দুই অংশ আছে। একটা অচেতন বৃহৎ গুপ্ত এবং নিশ্চেষ্ট আর একটা সচেতন সক্রিয় চঞ্চল পরিবর্তনশীল।”[১৫] সীতাদেবীকে গল্পটা বলেছিলেন ‘সচেতন’ রবীন্দ্রনাথ এবং রাত্রিতে নিজেকে প্রেতাত্মাভাবী হলেন ‘অচেতন’ রবীন্দ্রনাথ।

‘ক্ষুধিত পাষাণ’ গল্পেও দ্বিতীয় গল্প কথকের মধ্যে দুই সত্তা আছে। দিন এবং রাত দুই সময়ে তার দুই চরিত্র প্রকাশিত। সে নিজেই বলেছে, ‘দিনের বেলায় শ্রান্তক্লান্তদেহে কর্ম করিতে যাইতাম, এবং শূন্যস্বপ্নময়ী মায়াবিনী রাত্রিকে অভিসম্পাত করিতে থাকিতাম, আবার সন্ধ্যার পরে আমার দিনের বেলাকার কর্মবদ্ধ অস্তিত্বকে অত্যন্ত তুচ্ছ মিথ্যা এবং হাস্যকর বলিয়া বোধ হইত। সন্ধ্যার পরে আমি একটা নেশার জালের মধ্যে বিহ্বলভাবে জড়াইয়া পড়িতাম। শত শত বৎসর পূর্বেকার কোনো-এক অলিখিত ইতিহাসের অন্তর্গত আর-একটা অপূর্ব ব্যক্তি হইয়া উঠিতাম, তখন আর বিলাতী খাটো কোর্তা, এবং আঁট প্যান্টলুনে আমাকে মানাইত না। তখন আমি মাথায় এক লাল মখমলের ফেজ তুলিয়া, ঢিলা পায়জামা, ফুলকাটা কাবা এবং রেশমের দীর্ঘ চোগা পরিয়া, রঙিন রুমালে আতর মাখিয়া, বহুযত্নে সাজ করিতাম এবং সিগারেট্ ফেলিয়া দিয়া গোলাপজলপূর্ণ বহুকুণ্ডলায়িত বৃহৎ আলবোলা লইয়া এক উচ্চগদিবিশিষ্ট বড়ো কেদারায় বসিতাম। যেন রাত্রে কোন্-এক অপূর্ব প্রিয়সম্মিলনের জন্য পরমাগ্রহে প্রস্তুত হইয়া থাকিতাম।’[১৬] গল্প কথকের সঙ্গে রবীন্দ্রভাবনার মিল আছে, যার পরিচয় আমরা পাই ছিন্নপত্রাবলীর ১৪২ নং চিঠিতে। এখানে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ‘আমার মনে হয় দিনের জগৎটা যুরোপীয় সংগীত,সুরে-বেসুরে খণ্ডে-অংশে মিলে একটা গতিশীল প্রকাণ্ড হারমনির জটলা-- আর রাত্রের জগৎটা আমাদের ভারতবর্ষীয় সংগীত, একটি করুণ গম্ভীর অমিশ্র রাগিণী।’[১৭] গল্পের নায়কের কাছেও তো দিনের বেলা বিদেশি কাজের জগৎ এবং রাত্রিবেলা ভারতের ঐতিহ্যবাহী আরব্য রজনীর দেশ।

‘ক্ষুধিত পাষাণ’ গল্পের উৎপত্তি অন্য কিছু নয়, রবীন্দ্রনাথের কল্পলোক। এ কথা হেমন্তবালাদেবীকে চিঠিতে জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ‘ক্ষুধিত পাষাণের কল্পনাও কল্পলোক থেকে আমদানি।’[১৮] এই কল্পলোক ১৪৯ নং চিঠি (ছিন্নপত্রাবলী)-তে বেশ স্পষ্ট। এই চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— ‘এখানকার দুপুর বেলাকার মধ্যে বড়ো একটি নিবিড় মোহ আছে। রৌদ্রের উত্তাপ, নিস্তব্ধতা, নির্জনতা, পাখিদের বিশেষত কাকের দাক, এবং সুদীর্ঘ সুন্দর অবসর-- সব-সুদ্ধ জড়িয়ে আমাকে ভারী উদাস এবং আকুল করে। কেন

জানি নে, মনে হয় এই রকম সোনালি-রৌদ্রে-ভরা দুপুর বেলা দিয়ে আরব্য উপন্যাস তৈরি হয়েছে—অর্থাৎ সেই পারস্য এবং আরব্য দেশ, ডামাস্ক্ সমরকন্দ্ বুখারা--আঙুরের গুচ্ছ, গোলাপের বন, বুলবুলের গান, শিরাজের মদ... রহস্যপূর্ণ অপরিচিত সুদূর দেশে... মানুষের হাসিকান্না আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কত শত সহস্র রকমের সম্ভব অসম্ভব গল্প তৈরি হচ্ছে।"[১৯] এই কল্পনার সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে 'ভূতালোকপন্থী' গল্প রচনা করেছেন, রবীন্দ্র- ছোটগল্প সমালচক সুখরঞ্জন রায় তাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। সুখরঞ্জন রায়ের মতে, 'রক্তমাংসেয় অ তীতের বদলে অতীতের ভূত লইয়া এই যে মনোলোকের কারবার, ইহাই এই গল্পের বিশেষত্ব, ইহার মধ্যেই এই গল্পের অলোকরস নিহিত রহিয়াছে।'[২০]

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কল্পলোক এবং পরলোক— এই বিষয়ে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলাচলতা ছিল, যা তাঁর গল্পের মধ্যেও ওঠানামা করে। তবে অবিশ্বাসটাই বোধহয় জয়ী হয়, মেহের আলির 'সব ঝুট হ্যায়' বলার মাধ্যমে। রবীন্দ্রনাথ যেন একাধারে এই গল্পের সব ক'টি চরিত্র (ক্ষুধিত রাজপ্রাসাদ নয়)। গল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে দ্বন্দ্ব, মনে হয় তা রবীন্দ্রনাথেরও দ্বন্দ্ব। গল্পের দ্বিতীয় কথক, শা-মামুদের রাজপ্রাসাদে থাকাকালীন তার সঙ্গে যে অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল, তার ভাবনাচিন্তা এবং চরিত্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মিল আছে। প্রথমত, 'ছিন্নপত্রাবলী'র ১৪২ নং চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, দিনের জগৎ তার কাছে 'য়ুরোপীয় সংগীত' আর। রাত্রের জগৎটা 'ভারতবর্ষীয় সংগীত'। দ্বিতীয় হল, জমিদারি কাজের সূত্রে রবীন্দ্রনাথ দিনের বেলা মাশুল আদায়কারী এবং রাত্রিবলায় কবিসত্তার অধিকারী। তাই রবীন্দ্রনাথের যে সত্তা জানে রাজপ্রাসাদের জগৎ কল্পনার জগৎ, সে হল মেহের আলি। তার 'সব ঝুট হ্যায়'-এর মাধ্যমেই গল্পের দ্বিতীয় কথক সংবিৎ ফিরে পায়।।

গল্পের শুরুতে থিয়সফিস্ট আত্মীয় এবং অবিশ্বাসী ব্যক্তির মধ্যে চূড়ান্ত মতভেদের কারণে গল্পশেষে দু'জনের 'জন্মের মতো বিচ্ছেদ' ঘটে গেল। একজন আত্মীয়র সঙ্গে এই সামান্য কারণে এমন বিচ্ছেদ হওয়া নিশ্চয়ই সম্ভব নয়। আসলে হয়তো রবীন্দ্রনাথ নিজের দু'টি সত্তার মধ্যে একটি সত্তার সঙ্গে জন্মের মতো বিচ্ছেদ ঘটালেন।

পরলোকভাবনা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যেমন বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলাচলে এগিয়ে চলেছে, গল্পের মধ্যেও তা সেভাবেই প্রকাশিত হয়েছে। তাই রবীন্দ্রনাথের পরলোকভাবনা তাঁর গল্পে নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে, যার ফলে 'আবহ ও মনস্তত্ত্বপ্রধান, পরিবেশপ্রধান, ভাবনাধর্মী গল্প'[২১] হয়ে উঠেছে 'ক্ষুধিত পাষাণ'। এই ভাবনার মূল পরিবেশের গভীরে। সেই পরিবেশের মায়া সৃজনে তিনি সক্রিয়। দ্বান্দ্বিক প্রকরণে এই মায়া সৃষ্ট এই দ্বন্দ্ব মনেরও দ্বন্দ্ব; তাই আবহ মনস্তত্ত্ব অনুস্যুত।'[২২] এই মনস্তত্ত্বের মধ্য দিয়ে মানবজীবনের নিগূঢ়তম বেদনা গল্পে মুখর হয়ে উঠেছে।

পরলোক বললে সাধারণভাবে লোকায়ত যে ভৌতিক ধারণা আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করে, যেখানে পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরক এবং সর্বোপরি ভূত-প্রেত হয়ে ওঠে প্রধান, রবীন্দ্রনাথের পরলোক ধারণার মধ্যে এই ধরণের লোকায়ত-ভৌতিক ধারণার প্রশ্রয় পায়নি। রবীন্দ্রনাথের বীক্ষায় অনন্ত এবং অপরিমেয় জীবনের পটভূমি ছুঁয়ে গেছে পরলোকের সীমানাকে। পরলোক যেন ইহলোকেরই অগোচরে থাকা এক অনাবিষ্কৃত লোক। ভূত-প্রেত নয়, বরং পার্থিব ক্ষুদ্রতা থেকে মুক্ত এক বৃহতের নবলোক। রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় জগৎ যে-ভাবে সাধারণের সীমানাকে অতিক্রম করে বৃহতের চেতনায় ক্রমাগত প্রসারিত হতে থাকে, ইহলোকের সূদূর প্রসার ছুঁয়ে যায় পরলোককেও। তবুও ইহলোক আর পরলোকের সাধারণ সীমানাকে তিনি সর্বদা অস্বীকার করেছেন— এমনটা যে নয়, সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

শেষ পর্যন্ত আমরা যা দেখতে পাচ্ছি, রবীন্দ্রনাথ পরলোকচর্চা বিষয়ে আগ্রহী বা কৌতূহলী ছিলেন ঠিকই, তবে এই ভাবনা তার মধ্যে দৃঢ়মূল ছিল না। বরং তাঁর সত্তার মধ্যে ছিল এই ভাবনাকে নিয়ে দ্বন্দ্ব। তাই মৈত্রেয়ীদেবী বলেছেন, যিনি লিখেছেন, “জীবনেরে কে রাখিতে পারে, আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে’— তিনি কি ভাবছেন এই পৃথিবীর দু’দিনের সম্পর্কের গণ্ডী দিয়েই মানবাত্মা চিরদিনের জন্য চিহ্নিত, বন্দী হয়ে আছে?”[২৩] আর আমাদের মনে হয়, মৈত্রেয়ীদেবী বোধহয়, শান্তিনিকেতনের গুরু, প্রত্যেক বুধবারে ‘শান্তিনিকেতনে ভাষণ’ দাতা এবং কবি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কথাগুলি বলেছেন। ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের ভাবনা তো আলাদা হতেই পারে। আমরা আমাদের আলোচনা থেকে অনায়াসে বলতে পারি রবীন্দ্রনাথ পরলোক বিষয়ে সম্পূর্ণ আস্থাবান না হলেও মোটেই অবিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর মধ্যে এই বিষয়ে আগাগোড়া দ্বন্দ্ব ছিল। তাই আমরাও নির্দিষ্ট করে কিছু বলতে পারব না। পরলোক বিষয়টি যেমন স্পষ্ট নয়, নির্দিষ্ট নয়, ঠিক তেমনি আমাদের আলচনাকেও অনির্দিষ্টের সঙ্গেই সমাপ্ত করতে হল।

উল্লেখপঞ্জি:

১) ‘ক্ষুধিত পাষাণ’, ‘গল্পগুচ্ছ’, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, কলকাতা১৭, শ্রাবণ ১৪১৫, পৃষ্ঠা ২৭১।
২) তদেব।
৩) ‘জনহিতকর কার্যাবলী’, ‘স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য, পশুপতি শাশমল, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৩৭৮, পৃষ্ঠা ৯৯।
৪) তদেব, পৃষ্ঠা ১০০।
৫) তদেব।
৬) ‘ছেলেবেলা’, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র-রচনাবলী’, ‘ত্রয়োদশ খণ্ড’ বিশ্বভারতী, কলকাতা- ১৭, ১২৫তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, পৌষ ১৪১৫।
৭) রবীন্দ্রনাথের পরলোকচর্চা’, ‘একত্রে রবীন্দ্রনাথ’, অমিতাভ চৌধুরী, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭৩, তৃতীয় সংস্করণ শ্রাবণ ১৪১৯, অগাস্ট ২০১২, পৃষ্ঠা ১৭।
৮) তদেব।
৯) প্ল্যানচেট সম্বন্ধে’, ‘রবীন্দ্রনাথ গৃহে ও বিশ্বে’, মৈত্রেয়ীদেবী, প্রাইমা পাবলিকেশন, কলকাতা- ৭, পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ ৩ জুলাই, ২০১১/১৮ আষাঢ় ১৪১৮ রথযাত্রা, পৃষ্ঠা ১৬৭।
১০) তদেব, পৃষ্ঠা ১৬৬।
১১) তদেব, ১৬৮, ১৬৯ ।
১২) ১৬২ নং চিঠি, ‘নিজের কথা’, ‘নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখা রবীন্দ্রনাথের অর্ধসহস্র চিঠি’, সঙ্কলন ও সম্পাদনা অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, সহযোগী সম্পাদনা সুজিতকুমার বিশ্বাস, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা- ৭৩, প্রথম প্রকাশ, ২২ শ্রাবণ ১৪১৮, পৃষ্ঠা ২৪২।
১৩) ‘স্বপ্ন অতিপ্রাকৃত বিষয়’, ‘স্বপ্ন’, গিরীন্দ্রশেখর বসু, বিবেকানন্দ বুক সেন্টার, কলকাতা- ৭৩, তৃতীয় সংস্করণ মার্চ, ১৪১৯ (ইং ২০১৩), পৃষ্ঠা ৯৬ ।
১৪) পুণ্যস্মৃতি’, সীতা দেবী, বিশ্বভারতী, কলকাতা- ১৭, বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ পৌষ ১৪০৭, পৃষ্ঠা ১৫৪।

১৫) ‘অখণ্ডতা’, ‘পঞ্চভূত’, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র-রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা- ১৭, ১২৫তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, আশ্বিন ১৪১৫, পৃষ্ঠা ৯১৬।

১৬) ‘ক্ষুধিত পাষাণ’, ‘গল্পগুচ্ছ’, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, কলকাতা- ১৭, শ্রাবণ ১৪১০, পৃষ্ঠা ২৭৫ ।

১৭) ১৪২ নং চিঠি, ‘ছিন্নপত্রাবলী’, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, কলকাতা- ১৭, আষাঢ় ১৪১১, পৃষ্ঠা ২১৬।

১৮) ৪৫ নং চিঠি, ‘হেমন্তবালাদেবীকে লিখিত পত্রাবলী’, চিঠিপত্র নবম খণ্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, কলকাতা- ১৭, প্রকাশ বৈশাখ ১৩৭১, পৃষ্ঠা ৯৫।

১৯) ১৪৯ নং চিঠি, ‘ছিন্নপত্রাবলী’, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, কলকাতা- ১৭, আষাঢ় ১৪১১, পৃষ্ঠা ২২৫।

২০) ‘রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে অলোকপন্থা’, ‘রবীন্দ্র কথা-কাব্যের শিল্পসূত্র’, সুখরঞ্জন রায়, সঙ্কলক মিহিররঞ্জন রায়, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা- ৭৩, প্রথম প্রকাশ,ফাল্গুন ১৩৮৩, পৃষ্ঠা ১৫৪।

২১) ‘আবার প্রকরণ’, ‘ক্ষুধিত পাষাণ ও দুরাশা’, অতনু শাশমল, আড়াই সিধা পত্রিকা, দ্বিতীয় সংখ্যা ২০১৩, সম্পাদক এমানুর রেজা, মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল ৩১৩, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ১০০০, পৃষ্ঠা ১৩২।

২২) তদেব।

২৩) “প্ল্যানচেট সম্বন্ধে’, ‘রবীন্দ্রনাথ গৃহে ও বিশ্বে’, মৈত্রেয়ীদেবী, প্রাইমা পাবলিকেশন, কলকাতা- ৭, পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ ৩ জুলাই, - ২০১১/১৮ আষাঢ় ১৪১৮ রথযাত্রা, পৃষ্ঠা ১৬৯।